হরতালের গল্প

রিজিয়া রহমান

(ছোটগল্প)

হরতালের গল্প

রিজিয়া রহমান

বাস্তব ট্রাফিক সিগন্যালের মোড়ে ওরা তিনজন অপেক্ষা করছিল। অপেক্ষাটা বদুর জন্য। বদু বলেছিল হরতালের

দিন আসবে। একটানা দু'দিন হরতালের একটা দিন কেটে গেছে। আজ শেষ দিন। কাল বদু আসেনি। শেষ হরতালের সকালটাও ফুরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। অথচ এখনো বদু আসেনি। পার্কের দিক থেকে এক ঝলক হাওয়া উঠল হঠাৎ। গাছের ডালপালা মর্মরিত হল। সবুজ একটা ঢেউ গড়িয়ে যেন আলগোছে বয়ে গেল গাছগাছালির ওপর দিয়ে। দৃশ্যটা নির্বাক চোখে দেখল ন'বছরের হিরু। ওর ঠোঁটের দু'পাশের ঘা থেকে কষ গড়িয়ে পড়ছে।

একটা নীল মাছি ক্রমাগত ভন ভন করে উড়ছে মুখের ওপর। শূন্যে চড় মেরে মাছিটাকে তাড়াতে চেষ্টা করল হিরু। মাছিটা চক্কর দিয়ে উড়ে গেল দূরে। একটু পরেই ফিরে এল আবার। মুখ খিস্তি করল হিরু—শালার হারামি। একেবারে আঠা হইয়া লাইগা রইছে।

পাছ ছাড়ে না। হিরুর বাবা আছে। মা নেই। বাবা রাজমিস্ত্রির জোগালি। কাজ নিয়ে চলে যায় কোথায় কোথায়। হিরুর সঙ্গে দেখাই হয় না প্রায়। হিরু এখানে ম্যাচ ফেরি করে। ট্রাফিক সিগন্যালের ডানায় লাল আলো জ্বলে উঠলে গাড়ির লাইন পড়ে যায়।

হিরু তখন ম্যাচের বাস্ক নিয়ে খেমে থাকা গাড়িগুলোর জানালার কাচে টোকা দিতে থাকে, ম্যাচ লাগব স্যার? কেউ কেউ ম্যাচ কেনে। অনেকেই কেনে না। দোতলা বাসের ড্রাইভার হালিম মিয়া মানুষটা ভালো। হিরুকে দেখলেই গলা বাড়িয়ে ডাকে—ওই বিস্কু।

কাইল আমারে এক প্যাকেট ম্যাচ আইনা দিবি। প্রাইভেট কারের ড্রাইভারেরা হিরুর ম্যাচ কেনে না। উল্টো ধমকা-ধমকি করে। মাছিটা এবার দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে বসে পড়ল হিরুর নাকের ওপর। ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল হিরু—শালা...।

আমারে জ্বালাইয়া খাইল।

এইডারে খেদাইতে এইবার পুলিশ ডাকন লাগব।

হিরুর কথায় খিক খিক করে হেসে উঠল চুইংগাম ফেরিওয়ালার বারো বছরের বসির। ফুটপাথের ধারের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে সে চীনারাদামের খোসা ছাড়াচ্ছে। তার কোনাচে দৃষ্টি রাস্তার ওপারের ফুটপাথ ছুঁয়ে এল। ফুটপাথের ধার ঘেঁষে সেখানে শুরু হয়েছে পার্কের সীমানা, চোখের ইশারায় সেদিকেই ইঙ্গিত করল বসির—কারে গাইলাস? হেইপারের তাইন রে নি? বাদাম গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে ছোট্ট এক ঠোঙা মুড়ি নিয়ে তের বছরের রইস্যা থাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে মুড়ি চিবুনের সুখ।

গালভরা মুড়ি নিয়ে মুরকির মতো ধমকে উঠল—ওই হুমুন্দির...।

রংবাজি করনের আর জাগা নাই? জামিলা বুজির কানে একবার হান্দাইলে অয়।

গক্ষুর সাপের মোচড় দিয়া উঠব কইলাম।

চুপ মেরে গেল বসির।

জামিলার মেজাজকে ওরা চেনে।

আজ সকালেও একবার চিংকারে হরতালের ফাঁকা রাস্তা গরম করে তুলেছিল। এ দু'দিন হরতালে জামিলার ব্যবসা মন্দা। না খেয়েই কেটেছে রাত। সকালে মেজাজ ছিল একেবারে গনগনে কয়লা। গাল দিয়ে তুলোধোনা করেছে অপছন্দের হরতালকে আর অনুপস্থিত খন্দেরদের।

গলির মুদিদোকানির কাছ থেকে টাকা কর্জ করে দুপুরে একটা পাউরুটি খাবার পর শান্ত হয়েছে মেজাজ। এখন পার্কের জারুলগাছের ছায়ায় পা ছড়িয়ে বসে বিড়ি টানছে। খোশগল্প করছে সিগারেট ফেরিওয়ালি জোছনা খাতুনের সঙ্গে। জোছনা খাতুন হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলে চলেছে। মাথার ওপর চাঁদি কামড়ান রোদ, পেটে খিদের কামড়, এই দুই আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করবার শক্তি হরতালের দিনে হিরুর মোটেই থাকে না। দু'দিনে একটাও ম্যাচ বিক্রি হয়নি।

হবে কি করে। বোমা আর ভাঙচুরের ভয়ে লোকেরা গাড়িই নামায় না পথে, ম্যাচ কিনবে কে! পথে যত হুলাবাজ লোকের চলাচল। ওরা ম্যাচ কেনে না। পারলে আরো কেড়ে নেয় ম্যাচের ঠোঙা। বাধা দিলে পিকেটিংয়ের নামে বেধড়ক পিটিয়ে দিতে পারে। হিরুর যত রাগ এখন গিয়ে পড়ল জোছনা খাতুনের ওপর। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।

হিরুর ব্যবসায় টান ধরিয়েছে ওই জাঁহাবাজ ধূর্ত মেয়েলোকটাই।

ওদিকের ট্রাফিক সিগন্যাল মোড়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট আর দেশলাই বিক্রি করে।

শুধু বিক্রি নাকি।

খদ্দেরের মুখের সিগারেট ম্যাচ জ্বালিয়ে ধরিয়ে দেয়।

তার পর সেই ন্যাকামি—এই ম্যাচ বাতিডাও দিয়া দেই স্যার লগে?

ফাউ মুখে আগুন দেয়ার ব্যবসাদারি কৌশলে বাস ট্রাকের ড্রাইভারদের কাছে এখন জোছনা খাতুনের ম্যাচের কদর।

হিরুর ম্যাচের কদর নেই। যানবাহনশূন্য রাজপথে পায়েহাঁটা লোকজনের চলাচলও কমে গেছে। কিছু রিকশা চলছিল, এখন তাও নেই। শূন্য পথের মতোই দৃষ্টিটা শূন্য হয়ে যায় হিরুর। মাথা ঝিমঝিম করে। বসির শেষ চীনাবাদামটি ভাঙতে ভাঙতে হঠাৎ বলল—জামিলা বুজি কিন্তু মানুষ খুব ভালো। দিলডা নরম। তাই না রে! বসিরের মন্তব্যের প্রতিবাদ কেউ করল না।

ওরা তিন খুদে জীবন সংগ্রামী, যাদের ঘরবাড়ি নেই, মা-বাবা থাকতেও নেই, পথেই যাদের ঘরবাড়ি, তাদের কাছে জামিলার উপস্থিতিটা খুব দামি। জামিলাই এখানে ওদের অভিভাবক। ওদের ভালোমন্দের দায় যেন জামিলারই। সেবার রইসার পত্রিকা বিক্রির পয়সা ছিনতাই হল। জামিলাই কড়কড়ে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট হাতে ধরিয়ে দিয়ে লোকসানটাকে সামাল দিয়েছিল।

গত শীতে চুইংগাম ফেরি করবার সময় বেবিট্যাক্সির ধাক্কায় জখম হল বদু। জামিলাই ওকে রিকশায় তুলে নিয়ে গেল পঙ্গু হাসপাতালে। বদু ভালো না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালেই পড়ে থাকল। ম্যাচ ফেরি করতে করতে যখন হিরুর ঠোঁট বুক শুকিয়ে ওঠে, খিদেয় পেট মোচড়ায়, তখন কেমন করে যেন জামিলা বুঝতে পারে। রাস্তার ওপর থেকে হাঁক দেয়—ওই হির্যো। এখানে আয়। এক ঢোক পানি মুখে দিয়া যা। পানির সঙ্গে প্রায়ই দেয় একটা শুকনো বনরুটি, নয়তো এক মুঠো মুড়ি। মাঝেমাঝে হোটেল নিয়ে ভাতও খাওয়ায়। জামিলাও পথের মানুষ। একটা চটের বস্তায় ভরা থাকে ওর সংসার। সেটা মাঝে মাঝে জমা রাখে জোছনা খাতুনের কাছে, তার আগারগাঁও বস্তির ঘরে। এর জন্য ভাড়া নিতে ছাড়ে না জোছনা। রইস্যার মুড়ি খাওয়া শেষ। খালি ঠোঙাটা হাতে নিয়ে তাকাল দূরে। এখান থেকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ফার্মগেটের দিকে সেখানে কিছু লোকের জটল।

একটা দমকল গাড়ি ঘন্টা বাজাতে বাজাতে হুস করে চলে গেল, বসির সেদিকে তাকিয়ে বলল—আগুন লাগছে জানি কোহানে। হরতালের দিনের এইসব আগুন লাগালাগি, মারপিট, বোমা মারা একটুও ভালো লাগে না হিরুর। কেন যে এরা এসব করে কিছুতেই বুঝে ওঠে না সে। ওদের তো গরম পিচে পা পুড়িয়ে ম্যাচ ফেরি করতে হয় না, পেট ভরা খিদে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে পথেঘাটে ঘুমিয়ে পড়তে হয় না।

একটা রুটি অথবা এক ঠোঙা মুড়ি কিনবার পয়সা জোগাড়ের জন্য জামিলা বুজির মতো খদ্দেরের আশায় ল্যাম্পপোস্টের ধারে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। তাহলে? কি চায় ওরা! বদু একদিন বলেছিল এইসব হইতাছে ক্ষমতার লড়াই। অগোর ক্ষমতা দরকার। কথাটা একটুও বোঝেনি হিরু। টাকা থাকলেই তো ক্ষমতা আসে মানুষের হাতে। টাকা তো ওদের অনেক আছে।

টাকা থাকলে ফুটপাথে ফেরি করতে হয় না, শীতে কেঁপে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে পথে পড়ে থাকতে হয় না, খিদে তাড়াবার জন্য রঙ মেখে খদ্দের ধরতে হয় না।

ওরা গাড়ি চড়ে, বড় বাড়িতে থাকে, ফুর্তির জন্য দু'হাতে টাকা ওড়ায়, তবুও এইসব বড় লোক কেন যে হরতালবাজির নির্ভুর খেলা খেলতে থাকে! ওরা কি জানে না, এই খেলায় হিরুর কষ্ট বেড়ে যায়। জামিলা বুজি একদিন খুব রেগে গিয়ে বলেছিল, বুঝলি নি রে।

এসব হরতাল হইল একটা বড় কিসিমের মজার জুয়া খেলা। এই খেলায় হারলে তাগো ক্ষেতি হয় না, আমাগো নাহান পথের মানুষ না খাইয়া থাকে, বোমায় মরে, গুলি খায়, ক্ষেতি আমাগো। জিতলে তাগো লাভ। মানুষরে না মারলে এই খেলায় জিতা যায় না। এইডা হইল গিয়া মানুষ মারার জুয়া খেলা। এই খেলায় আমাগো কপাল বদলায় না। মুড়ির ঠোঙাটা ফুঁ দিয়ে ফুলিয়ে জবরদস্ত একটা ঘুষি বসাল রইস্যা। দম করে ফেটে গেল সেটা। চমকে উঠল হিরু, বসির দু'জনেই।

জামিলাদের খোশগল্পও থমকাল। ক্রাচ বগলে গিয়ে ভিষ্কার আশায় ঘোরাঘুরি করে হতাশ হয়ে বসে ছিল পঙ্গু ভিষ্কুক জবেদ আলী। গলা উঁচিয়ে দূর থেকেই জিঞ্জেস করল—ওই রইস্যা, ওই বসির হইল কি রে? কিয়ের আওয়াজ হইল? দাঁত বের করে হাসল রইস্যা—বোমা মারলাম। ডরাইছ নি কাকা? ক্রাচ উঠিয়ে কপট শাসন করল জবেদ আলী—মর হারামি।

—গাইলাইবা না কাকা।

খবরদার! জামিলা হাসছে।

গলা তুলে চঁচিয়ে বলল—কারে মারলি রে বোমা, ও রইস্যা? —হরতালরে গো বুজি।

হরতালরে একটা বোমা ফেইকা মারলাম।

এতক্ষণের বিপ্তী দম আটকানো পরিবেশটা হালকা হয়ে গেল।

রইস্যার রসিকতায় সবাই মিলে হাসাহাসি করল কিছুক্ষণ।

দিনটা আজ সত্যি চড়া।

কার্তিক মাস যায় যায়। তবু আসমানে ফাটাফাটি রোদের ঝলক। এমন রোদে পেটে খিদে নিয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যায়।

বসির বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল—বদু ভাইর আইজ অইল কি! অহন ত্যামত আইতাছে না! —অয় আইজ আইত না।

খামাখাই আমাগো বহাইয়া খুইল। রইস্যা এখনো আশা ছাড়ে নি। রাস্তার শেষ মাথায় প্রতীক্ষার দৃষ্টি ধরে রেখে বলল—দিন

তো শ্যাষ হয় নাই। দেহি না আরো কতক্ষণ। কিন্তু কথা ছিল অন্যরকম। বদু বলেছিল সকালের দিকেই চলে আসবে।

ওদের নিয়ে যাবে বাসস্ট্যান্ডে। সেখান থেকে ছাড়বে বাস। ওদের কিছুই করতে হবে না। কেবল বিনা ভাড়ার যাত্রী হয়ে

শহরময় ঘুরে বেড়াবে। ঘণ্টাখানেক পরেই নামিয়ে দেবে। জনপ্রতি টাকাও দেওয়া হবে।

হিরু খুব অবাক হয়েছিল, আমাগো ট্যাকাও দিব আবার বাসে উডাইয়া ঘুরাইব? অন্যদিন তো ভাড়া দিবার না পারলে ঘোটি ধইরা নামাইয়া দেয়। এইডা আবার কেমন কথা! বদু, রইস্যা, বসির সবাই হেসে ফেলেছিল হিরুর কথায়। পরে অবশ্য হিরু জেনেছিল এ হল হরতালের বাস সার্ভিস। মানুষ টিভিতে দেখবে হরতাল হয়নি। বাস ট্রাক সবই চলাচল করেছে। হিরুর হঠাৎ খুব পেট ব্যথা শুরু হয়ে যায়। ফুটপাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। ক্রমে নিশ্বেজ হয়ে আসে শরীর। চোখের সামনে চড়া রোদের দুপুর কাঁপতে থাকে। রাস্তার ওপারে থেকে জামিলা চোঁচিয়ে ওঠে—আলো মরা। ওইডা আবার মাটিতে গইড দিয়া পড়ল ক্যারে। ওই হির্যাচ, কি অইছে রে? প্যাডে ভুখ লাগছে নি? বুঝছি ভুখে মরতাছস! হিরু হঠাৎ ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। সেই কাল দুপুরে কিনেছিল পারাটা আর ভাজি। তাই খেয়েই কাটিয়েছে কাল। তারপর থেকে আর খাওয়া নেই। জামিলা তিন লাফে রাস্তা পেরিয়ে ঢুকে গেল গলিতে। দুটো চাঁপা কলা হাতে নিয়ে ফিরে এল তখনি। কলা দুটো হিরুর হাতে দিয়ে বলল—নে খা। খাইয়া মর।

না খাইয়া মরিস না। ছ্যাড়া তর লাইগা ক্যালা ভিক্ষা চাইয়া আনলাম দোকানের খনে। কলা খেয়ে উঠে বসল হিরু। বায়না ধরা শিশুর মতো জামিলার হাত আঁকড়ে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—হরতাল ক্যান শ্যাষ হয় না জামিলা বুজি। আমার যে প্যাটের ভুখ যায় না। মাযের মতো করে হিরুর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল জামিলা—কাইল্দো না সোনা ভাইডি। কাইল্দো না। আর দেরি নাই সাইঝাঁ লাগতে। সাইনজা লাগলেই হরতাল ভাঙব। তখন ঠেইলা গাড়ি নামব রাস্তায়।

তর সবডি ম্যাচ বিক্রি হইয়া শাইব।

আমিও কাস্টমার পামু।

আমি আর তুই হৈঠল থনে ভাত কিনা খামু রাইতে।

কী দিয়া ভাত খাবি?

মাছ না গোস্ত?

ভাত, মাছ, মাংস শব্দগুলো যেন ছেলে ভোলানো ছড়াগানের মতো গুনগুনিয়ে বরল জামিলার কন্ঠ থেকে। কান্না থেমে গেল হিরুর। এখন বদুর জন্য নয়। সে রইল হরতাল শেষ হবার অপেক্ষায়। রইল ভাতের প্রতীক্ষায়। জামিলা উঠে চলে গেল নিজের আস্তানায়। হিরুর কান্নার বিষণ্ণতা ছুঁয়ে দিয়েছে রইস্যা আর বসিরকেও। ফেটে যাওয়া ঠোঙার কাগজ ছিঁড়ে কুটি কুটি করছিল রইস্যা। কাগজগুলো দলা পাকিয়ে ছুড়ে দিল পথের ওপর।

বলে উঠল—না, আর ভালো লাগে না।

ডেলি-ডেলি এত হরতাল হইলে ফেরি কইরা প্যাটের ভাত জুটামু ক্যামনে?

এই কাম ছাইড়া দিমু।

অহন বড় কাম ধরুম।

একটানে সোজা হয়ে গেল বসির—বড় কাম নি ধরবি?

বসিরের কথার রুক্ষতা পরোয়া করল না রইস্যা, জেদির মতো বলল—হ ধরুমই তো। ডাইলের কামে পয়সা বেশি, হেই কাম ধরলে হরতালে না খাইয়া মরণ লাগব না আর। —মরবি না! তাইলে বারেইক্যা লাশ হইল ক্যান? বারেকের প্রসঙ্গ উঠতে অস্বস্তিকর নীরবতা থমকে দাঁড়াল। বারেক ছিল ওদের মতোই পথের মানুষ। এই ট্রাফিক লাইটের মোড়েই ফেরি করত চুইংগাম, রজনীগন্ধার ছড়া আর সিনেমা পত্রিকা।

ট্রাফিক পুলিশের ডাঙা খেয়ে ফেরিওয়ালার জীবনটাকে একদিন ছুড়ে ফেলে দিল। এখানে দাঁড়িয়েই প্রচণ্ড চিংকারে শূন্যে নালিশ ছুড়ল—এই শহরে আমাগো লিগা হালাল রুজি নাই। অহন যদি আমি ফেনসিডিল আর হেরোইনের ব্যবসায় নামি, যদি সন্লাসী হইয়া যাই তাইলে কার কি কওনের আছে! ‘ডাইলের’ ব্যবসাতেই নেমে পড়ল বারেক।

ফেনসিডিলের বোতল এক আস্তানা থেকে আরেক আস্তানায় পাচার করার কাজ তার। দুহাতে রোজগার করে ঠাঁটে-বাটে চলতে শিখে ফেলল কদিনেই। তারপর যা হবার তাই হল। ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। গরুর পিটু নি খেল। কারা যেন ওকে থানা থেকে ছাড়িয়েও নিয়ে এল। কিন্তু তারপর থেকে বারেক নিখোঁজ। ওকে কেউ আর কখনো এ শহরে দেখেনি। বদু বলেছিল, অয় আর বাঁইচ্যা নাই। আমার খে ঠাহে অরে খুন কইরা ফালাইছে।

ক্যান ক্যান?

খুন করল ক্যান?

ক্যাঠায় খুন করল?

সঙ্গীদের প্রশ্নের জবাব বদু এক কথায় দিয়ে দিয়েছে—এই ব্যবসা খুনোখুনির।

তারপর বুকিয়ে বলেছে, অয় যে ডাইলের আস্তানার খবর জাইনা ফালাইছিল।

বুঝস না ক্যান,

কানে ধইরা টান দিলে মাথাডা আইয়া পড়ে।

কানডা কাইট্যা ফালাইলে মাথা বাঁচে। বারেইক্যারে শ্যাম না করলে যে পালের গোদাডি ধরা খাইয়া যায়। বদুই দলের মধ্যে

বয়সে সবার বড়। বুদ্ধিতে চৌকস। অভিজ্ঞতায়ও পাকা। ওকে সবাই দলের নেতার গুরুস্বই দিয়ে থাকে। বদু সবাইকে

সাবধান করে দিয়েছে—ওইসব ট্যাকার ফান্দে পাড়া দিছ কি মরচ। ভুলেও ডাইল, হেরন আর বোমাবাজির কামে যাবি

না। সেই বুদ্ধিমান বদুই কিনা শেষে রাত জেগে দেয়ালে চিকা মারতে গিয়ে পড়ল দুর্দান্ত ক্ষমতাস্বরদের খপ্পরে।

এর মধ্যে দু'বার হাজত খাটা হয়ে গেছে তার। হরতালের সময় ছোটখাটো সন্ত্রাসী কাজের শিক্ষানবিসিতে রীতিমতো

ভালোভাবেই উতরে যাচ্ছে সে। বদু এখন কিশোর মস্তানদের মধ্যে উঠতি তারকা। বসির হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

ক্ষেপে উঠে ওর দিকে তেড়ে গেল রইস্যা—হাসনের কী হইল! আমি কি হাসনের কথা কইছি? থামা হাসি।

বসির রাগল না একটুও।

হাসতে হাসতে বলল— বদুডায় কেমন একখান ঠক খাইওয়াইল আমাগো! এক্কেবারে বোকা বানাইয়া দিল। ঠইকা ঠইকাই

আমরা বাঁইচা রইছি।

অহন খাইতাছি হরতালের ঠক।

বসিরের অদ্ভুত কথায় বোকার মতোই কয়েক পলক ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রইস্যা।

তারপরই হাসতে শুরু করল—এই যে শুন সবটিতে বসির কয় কি!

অয় কয় আমরা নাকি ভাতের বদলে খাইতাছি হরতালের ঠক!

আমাগো পাতিলে ভাত নাই হরতাল আছে।

হাত নেড়ে নেচে কথাগুলো বার বার বলে চলল রইস্যা।

যেন মজার তামাশা হচ্ছে। বসির হেসে গড়িয়ে পড়ল। ওর সঙ্গে রইস্যা হাসছে। হাসতে হাসতে ওর দম বন্ধ হয়ে চোখ দিয়ে

পানি গড়িয়ে পড়ছে। ওদের হাসির শব্দ গুমোট দুপুরে কাঁপন তুলে দিল। ধাক্কা দিল জামিলাদের খোশগল্লে। কোমরে দু'হাত

রেখে চাঁচিয়ে উঠল কলহপটু মুখরা জামিলা—ওই! ওই রস্যা! ওই বসির! আরে ওই! এমন, হিটকাইতে আছস ক্যান? রঙ

লাগল নি। এইডা কি হিটকানের দিন? রঙ তামাশার দিন! মানুষ মরতাছে না খাইয়া, মানুষ মরতাছে বোমায়। আর তরা

হাইসা জারে জার। হাসি থেমে গেল ওদের। রইস্যার কানের কাছে ফিস ফিস করল বসির—ওইডারেও পাগলামিতে ধরছে।
অহন গোক্ষুর সাপটা ছাইড়া না দিলেই হয়। ঠিক তখনি ফার্মগেটের দিক থেকে দুমদাম করে বোমা ফাটার শব্দ এসে
আছড়ে পড়ল পার্কের নিস্তরঙ্গ বাতাসে।

সেই সঙ্গে ভেসে এল মানুষের হল্পার আওয়াজ। খুব নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ওদিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল বসির।
নির্বিকারভাবে বলল—দুই দলে ধাওয়াধাওয়ি করতাকে। ফুটপাথে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে আবার হিরু। উপবাসী
করে রাখা এই হরতালের দিনটাকে সে প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করল। কেন যে সে টাকা পাবার আশায় আর গাড়ি চড়ার লোভে
বদুর কথায় রাজি হয়েছিল। বরং কাওরান বাজারে গিয়ে দোকানির ফরমামেশ খেটে দিলে দুপুরে খাওয়ার পয়সাটা
জোগাড় হয়ে যেত। পর পর আরো কয়েকটি বোমা ফাটল। গুলির আওয়াজও হল।

রুখে উঠল জামিলা, হাতের মুঠি ঘুরিয়ে তার সেই সাপ নাচান ভঙ্গিটা নিয়ে ফেলল—খা, খা।
শতুররে খা। যারা আমাগো মুখের ভাত কাইড়া খায় তাগো খা।

যারা আমাগো ভিটাছাড়া করে তাগো খা।

জামিলার এই সাপ নাচান সংলাপ আর এই মারমুখী ভঙ্গি বন্দি দুপুরে তীর ধারাল ঝলকে ঝলে উঠল ক'জন ক্ষুধার্ত ক্লান্ত
উপায়হীন মানুষের সামনে। ম্যাচ ফেরিওয়ালি সদা অনাহারী জোছনা খাতুনের ভাঙাচোরা মুখে ঝলে উঠল ঘৃণা আর
ক্ষোভ। চাপা উচ্চারণে বলল—আর মানুষ না। অরা আমার গেদীর বাপেরে...। কথাটা শেষ করতে পারল না জোছনা।

কেঁদে উঠল হ হ করে। এমনি এক হরতালে তার রিকশাওয়ালা স্বামীকে রিকশাসমেত আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।
জারুলগাছের গোড়ায় মাথা ঠেকিয়ে বিলাপ করতে লাগল জোছনা খাতুন— আমি বিচার চাই। ক্যান আমার স্বামীরে
পোড়াইয়া মারল, ক্যান আমার তিনডা মাসুম বাচ্চার মুখের ভাত কাইড়া নিল। তার বিচার চাই আমি। সবার মাঝেই
যেন জেগে উঠতে থাকে জোছনা খাতুনের দাবির অনুরণন। বিচার চাই। আমরা বিচার চাই।

আমাদের ভাগের পয়সা লুটে নিয়ে যারা বড় গাড়ি চড়ে, দালানকোঠা ওঠায়, সোনাদানা টাকাকড়ি গাঁটরি বাঁধে তাদের
বিচার চাই। আমরা মুখ খুলতে গেলে যারা মস্তান দিয়ে পিটিয়ে তক্তা বানায়, তাদের বিচার চাই। যারা ভোট নেবার জন্য
মিথ্যা আশা দেয়, আর ভোট পাবার পর আমাদের পুলিশি ডাণ্ডা দেখায় তাদের বিচার চাই। আমাদের ভাগের পয়সা
লুটবার লোভে যারা ক্ষমতার জন্য লড়াই করে তাদের বিচার চাই। মনের মাঝে নতুন করে জেগে ওঠা অচেনা
দাবিগুলোকে ওরা ভয় পেল।

ওরা নিঃশব্দ নির্বাক দর্শক হয়ে গেল, কেবল জামিলা সাপ নাচান সংলাপে গলা ফাটিয়ে ফেলছে। আর জোছনা খাতুন বিচারের দাবিতে কেঁদে কেঁদে মাথা কুটেই মরতে লাগল। ফার্মগেটের দিক থেকে তখন ধেয়ে আসছে দুটি বিবদমান মিছিল, ঘন ঘন বোমা আর গুলির শব্দ। আসছে পুলিশের গাড়ি, দাঙ্গা পুলিশ, রবার বুলেট, টিয়ারগ্যাস। মানুষ ছুটছে দিশাহারা হয়ে।

কয়েকজন আতঙ্কিত পথচারী ছুটে এল এদিকে। পার্কের দেয়াল উপকে পালাতে পালাতে ওদের সাবধান করে দিয়ে গেল—ওই ছ্যাড়ারা। পলা জলদি। পলা জলদি। গুলি হইতাছে। পিকেটাররা বোমা ফেকতে আছে। পুলিশ টিয়ারগ্যাস ছাড়ছে।

লার্টিচার্জ করতে করতে এই দিকেই আইতাছে। জামিলা এক পাও নড়ল না। স্বলন্ত দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বলল—প্যাডের জ্বালাই এই পেশায় আইছি।

অহন আর কিছুরেই ডরাই না। আমাগো আবার কিসের ডর? ভাত নাই, ঘর নাই, ইজ্জত নাই, কারে ডরামু? হঠাৎ জোছনা খাতুনকেই প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বসল—ওই করস কী? গাছে মাথা কুটলেই য্যান বিচার পাওয়া যায়! বিচার করে ক্যাঠায়! বিচার তো অহন আমাগো হাতে।

উঠ। উইঠা খাড়া! ন'বছরের ক্ষুধার্ত শিশু হিরুও উঠে দাঁড়াল একটানে। তার বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে এখন অস্ত্রধারী সংঘর্ষকারী আর বোমাবাজ সন্ত্রাসীদের রাজপথ দখলের উন্মাদ লড়াই। ওদিকে শূন্য এজলাসের নিঃসঙ্গ বিচারকের মতো একা দাঁড়িয়ে আছে জামিলা। জোছনা খাতুনই প্রথম উঠে দাঁড়াল। ওরা তিনজনও একে একে এসে দাঁড়াল জামিলার পাশে। ক্রাচ খটখটিয়ে চলে এল পঙ্গু ভিখারি জবেদ আলীও। তারপর যত দুঃখী নিরন্ন নিরাশ্রয় মানুষের স্রোত বয়ে আসতেই থাকল। অমানবিকতার প্রতিরোধে তারা সবাই মিলে তৈরি করে ফেলল এক বিশাল মানববন্ধন। বই নিয়ে শুধুমাত্র বই নিয়েই আমাদের এই প্রয়াস। ধ্বংস ও ধসের সামনে বই সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ। বই আমাদের মৌলিক চিন্তাভাবনার শাগিত অস্ত্র।

বইয়ের অস্তিত্ব নিয়ে চারিদিকে আশঙ্কা, বই নিয়ে শুধু মাত্র বই নিয়েই আমাদের এই প্রয়াস। ধ্বংস ও ধসের সামনে বই সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ। বই আমাদের মৌলিক চিন্তাভাবনার শাগিত অস্ত্র। বইয়ের অস্তিত্ব নিয়ে চারিদিকে আশঙ্কা, নতুন প্রজন্ম চক্ৰমকের আকর্ষণে বইয়ের দিক থেকে ঘুরিয়ে নিচ্ছে মুখ। আমাদের এ আয়োজন বইয়ের সাথে মানুষের সম্পর্ককে অনিশেষ ও অবিচ্ছিন্ন করে রাখা। আশাকরি আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের এই ইচ্ছা আরোও দৃঢ় হবে। দুনিয়ার পাঠক এক হও! বাংলা বই বিশ্বের বিবিধ স্থানে, সকল বাংলাভাষীর কাছে সহজলভ্য হোক!

PDF By BDebooks.com